ইউনিট ৩

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদ্ধতি

ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম ও কর্মকান্ড জনকল্যাণে নিবেদিত। রাষ্ট্রের সকল স্তরের প্রশাসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করেন। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বিভাগে সকলের জন্য সমানভাবে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র মূলনীতি ইসলামী শাসনের অক্ষুন্ন রোখে সময় ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অন্য সব রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রশাসন থেকে হয় প্রগতিময় এবং দেশ-জাতি ও নাগরিকদের জন্য হয় কল্যাণধর্মী।

এ ইউনিটে মোট পাঁচটি পাঠ রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

❖ পাঠ ঃ ১ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো
❖ পাঠ ঃ ২ ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা
❖ পাঠ ঃ ৩ ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিকব্যবস্থা
❖ পাঠ ঃ ৪ ইসলামী রাষ্ট্রর শিক্ষাব্যবস্থা
❖ পাঠ ঃ ৫ ইসলামী রাষ্ট্রের জন ও সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা

পাঠ ঃ ১ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- মদীনা সনদের সারসংক্ষেপ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থবিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের সমর এবং শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মহানবী (স.)-এর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি মানব জাতির একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকরণীয় আদর্শ। আরবরা ছিল তখন শতধা বিভক্ত। মহানবী (স.) মদীনায় হিজরত করে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান। তিনি মদীনা সনদ উপহার দিয়ে জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন। এ সনদের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ রচিত হয়। এ রাষ্ট্রের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন স্বয়ং তিনি। তাঁর প্রশাসন ছিল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট একান্ত বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী। তাঁর প্রশাসন সম্পর্কিত একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মদীনার সনদের সারসংক্ষেপ ঃ

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপরেখা তুলে ধরতে হলে মদীনার সনদ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা জরুরি।

ক. মদীনার আনসার, মুহাজির, খৃষ্টান, ইয়াহূদী এবং তাদের মাওয়ালী ও মিত্রবর্গ সকলে মিলে একটি অখন্ড জাতি (উম্মাহ) বলে পরিগণিত হবে। এই রাষ্ট্রে সকলের জন্য সমানাধিকার স্বীকৃত। আবার দুশমনের হামলা থেকে মদীনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্বও সকলের উপর বর্তাবে। যুদ্ধের সময় প্রত্যেকে স্ব-স্ব ব্যয়ভার নির্বাহ করবে। সনদের অংগীভূত সকল জাতি নির্বিঘ্নে স্ব-স্ব ধর্ম পালন করবে।

খ. উম্মাহভুক্ত কেউ নবী করীম (স) -এর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধে গমন করতে পারবে না। আল্লাহতে বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য কারো সংগে কেউ পৃথক চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না এবং মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। মদীনা আক্রান্ত হলে সকলেই সমভাবে প্রতিরোধ করবে।

গ. মদীনায় বসবাসরত ইয়াহূদীরাও মুসলমানদের সাথে এক জাতি হিসেবে গণ্য। যতদিন তারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয় ততদিন তারা সমানাধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে।

ঘ. যুদ্ধ বা শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই মদীনায় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নেতৃত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত।

ঙ. বিচারব্যবস্থায় মহানবীর সর্বময় কর্তৃত্ব ঘোষণা করা হয় এবং নিজেদের মধ্যে যে কোন বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসার দায়িত্ব তাঁর উপর সোপর্দ করা হয়।

চ. মক্কার কুরায়শরা সাধারণভাবে মদীনা রাষ্ট্রের প্রকাশ্য দুশমন। তাদেরকে বা তাদের মিত্রদেরকে সহায়তা করতে নিষেধ করা হয়।

ছ. সনদে আরও বলা হয় যে, প্রত্যেকটি গোত্র সামগ্রিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সার্বভৌম ক্ষমতা ও নেতৃত্ব মেনে চলবে। তবে স্ব-স্ব গোত্রপতিদের গোত্রীয় প্রাধান্যও অক্ষুণ্ন থাকবে। প্রত্যেকটি গোত্র তাদের পূর্ববর্তী চুক্তিবদ্ধ এবং দেয় 'মৃত্যুপণ' ও 'মুক্তিপণ'সমূহ এককভাবে প্রদান করবে। সেখানে রাষ্ট্র কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

রাষ্ট্রীয় প্রধান

মহানবী (স) তাঁর প্রদত্ত সনদের আলোকে মদীনা রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতির মর্যাদায় ভূষিত হন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে সরকার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি সকলের সমান নাগরিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগসমূহ

সরকার পরিচালনার কোন আদর্শ তাঁর সামনে ছিলো না। তিনি তাঁর অপরিসীম প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও প্রখর বুদ্ধি বলে মদীনার মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে একটি সচিবালয় সদৃশ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলেন। পৃথিবীর রাষ্ট্র দর্শনের ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরকার একটি অনুপম দৃষ্টন্ত হয়ে রয়েছে। মদীনার এই রাষ্ট্রটি ছিলো মানব সভ্যতার ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ছিল বিভিন্ন দফতর ও বিভাগ। দফতর ও বিভাগগুলো ছিলো নিম্নরূপ ঃ

রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ ঃ বিশ্বনবী (স) ছিলেন মদীনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের মহানায়ক। হযরত হানযালা ইবনে আর-রাবী (রা.) ছিলেন রসূল করীম (স)-এর একান্ত সচিব। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীল সংরক্ষণ করতেন।

ওহী লিখন বিভাগ ঃ এই দফতরের সাথে সংশ্লিষ্টদের 'কাতিব' বলা হতো। হযরত আলী (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) মূল ওহী লেখক ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) এবং হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত হতেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ওহী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দাওয়া বিভাগ ঃ এ বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রসূল (স)-এর নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তিনি স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচারকদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নিকট প্রেরণ করতেন। আল্লাহর যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার আহবান জানানো ছিলো প্রচারকদের মূল কাজ। এছাড়া যাঁরা ইসলামের সুশীতল নীড়ে আশ্রয় নিতেন তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া, তাঁদের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাও প্রচারকদের অন্যতম দায়িত্ব ছিলো।

পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূল (স)-এর বিভিন্ন ফরমান, বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠি লিখন, প্রাপ্ত তথ্যাবলী এবং চিঠি পত্রাদি অনুবাদ করা ছিল এই বিভাগের দায়িত্ব। যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.) এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিভাগ ঃ বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে সমঝোতামূলক যোগসূত্র স্থাপন ও তাদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক আচরণ সম্পর্কীয় কার্যাবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা ও হাসান ইবনে নুমায়র (রা)।

অভ্যর্থনা বিভাগ ঃ রাসূল করীম সা.-এর দরবারে সর্বদা সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ভীড় লেগে থাকতো। এঁদের অভ্যর্থনা ও সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) এবং হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) ।

নিরাপত্তা (পুলিশ) বিভাগ ঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য কোন পুলিশবাহিনী ছিলো না। তবে একদল নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবী সাহাবী নিরাপত্তা ও প্রহরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিভাগকে আশ্-শুরতা বলা হতো। হযরত কায়স ইবনে সা'দ (রা.) এ বিভাগের প্রধান ছিলেন।

প্রতিরক্ষা বিভাগ ঃ রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে ইসলামী বিপ্লবের সংঘাতময় পর্ব উত্তরণের জন্য রাসূল (সা) প্রতিটি মুসলমানকে সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। মদীনা রাষ্ট্রে কোন বেতনভোগী সেনাবাহিনী ছিলো না। প্রয়োজনে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই মুজাহিদ হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রণাঙ্গণে উপস্থিত হতেন। মহানবী (স) স্বয়ং ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। সৈন্যগণ ছিলেন পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও বর্মধারী।

সমরাস্ত্র নির্মাণ বিভাগ ঃ আল্লাহদ্রোহীদের সাথে মুকাবিলার জন্য যুগোপযোগী সমরাস্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনা ছিলো মহানবীর সামরিক কলাকৌশলের একটি অনন্য দিক। তরবারি, তীর, ধনুক, ঢাল, বল্লম, মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র)

ইত্যাদি জরুরী যুদ্ধাস্ত্র তৈরী ও সংরক্ষণ কার্যাদি এ বিভাগের আওতাধীন ছিল। হযরত সালমান আল-ফারসী (রা.) ছিলেন রাসূল করীম (স.)-এর সামরিক উপদেষ্টা।

বিচার বিভাগ ঃ রাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ের প্রধান হিসেবে রাসূল (স.) বিচার বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। হযরত আলী (রা.) এবং মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ বিচারকার্যও সম্পাদন করতেন।

হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ ঃ জাতীয় আয় ও ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুয়াইকীব ইবনে আবি ফাতিমা (রা.)। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।

যাকাত ও সাদকাহ বিভাগ ঃ যাকাত ও সাদকাহসহ যেসব সম্পদ ও অর্থকড়ি সংগৃহীত হতো সেগুলোর হিসেব সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) ও যুহাইর ইবনে আস-সালতা (রা.)-এর উপর। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেছিলে।

খেজুর বৃক্ষের কর আদায় বিভাগ ঃ মদীনা রাষ্ট্রে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল খুরমা-খেজুর। মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ খেজুর কর হিসেবে রাজকোষে আসতো। হযরত হুযায়ফা ইবনে আল-ইয়ামান (রা.) ছিলেন এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত।

আদম শুমারী বিভাগ ঃ বিভিন্ন গোত্র এবং তাদের জলাশয়, আনসার, মুহাজির, পুরুষ ও মহিলাদের হিসাব সংরক্ষণ করতেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.) এবং হযরত আলা ইবনে উকবা (রা.)।

নগর প্রশাসন বিভাগ ঃ হযরত উমর ফারূক (র.) এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

নগর উন্নয়ন ও প্রকৌশল বিভাগ ঃ গণপূর্ত ও নগর উন্নয়নের ভিত্তি এ সময়ে রচিত হয়। ঘরবাড়ী তৈরীর নকশা ও প্ল্যান তৈরীর কাজ শুরু হয়। মিনার ও মসজিদে নববীর স্থাপত্য কৌশলের পূর্বাভাস রসূল (স.)-এর যুগেই হয়েছিল। ইবনে সাদ তাঁর তাবাকাতে লিখেছেন, সে সময় রাসূল (স.) যে জমির উপর বাড়ীর স্থান নির্ধারণ করেছিলেন অদ্যাবধি হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ী সে স্থানেই বিদ্যমান রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ ঃ মদীনা রাষ্ট্রের জনসাধারণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতেন। হারিস ইবনে সালাহ তৎকালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসকগণ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা পেতেন। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য মহানবী (স.) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদেশ-নিষেধ জারি করেন।

এভাবে মহানবী (স.) প্রতিষ্ঠিত নবীন ইসলামী রাষ্ট্রে একটি বহুমুখী কার্যাবলী আনজাম দেওয়ায় সুষ্ঠু নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছিল।

পররাষ্ট্র বিভাগ

পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সমঝোতা, মৈত্রীবন্ধনে উদারতা এবং শত্রুর প্রতি ক্ষমা সুন্দর মনোভাব পোষণ ছিলো রাসূলে করীম (স.)-এর পরাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। চরম শত্রুর প্রতিও ক্ষমাসুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ ঔদার্য প্রদর্শন করা ছিলো তাঁর নীতি। মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদেরকে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা করেন এবং তায়েফের অত্যাচারী সম্প্রদায়কে ক্ষমা ও তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত কামনার মাধ্যমে তিনি অনুপম কুটনৈতিক মহানুভবতার পরিচয় দেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মক্কাবাসীদের বহু শর্তকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে এই চুক্তির প্রতি অবিচল থেকে কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক কিংবা ত্রিপাক্ষিক চুক্তিসমূহের শর্ত প্রতিপালনে তিনি যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন্। উম্মী নবী (স.)-এর পক্ষে লিখিত এসব চুক্তি ও দলীলের আক্ষরিক বিধানের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা প্রদর্শন এক বিস্ময়কর ব্যাপার বৈ কি !

অর্থ বিভাগ

রাষ্ট্রনায়ক নবী করীম (স.) রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ রাষ্ট্রের প্রশাসনে ও সামরিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রের গরীব নাগরিকদের ভরণ-পোষণ ও পুনর্বাসনের জন্য এক সুসংহত অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করেন।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ

ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গেও নবী করীম (স.)-এর সুস্পষ্ট নীতি ছিলো। যে ব্যক্তি পতিত ভূমিকে আবাদ করবে, সে তার মালিক হবে। যে ব্যক্তি কোন ভূমিকে প্রাচীর দ্বারা ঘিরে নেবে তা তার মালিকানায় চলে যাবে। জমি বর্গা চাষের বিধান ছিল। চাষাবাদের শর্তে রাষ্ট্রীয় খাস জমি বন্দোবস্ত বা জায়গীর হিসেবে দেওয়া হতো।

সামরিক প্রশাসন

সময়ের স্বল্পতা ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্ব-স্ব ব্যস্ততার দরুন মহানবী (স.) নিয়মিত সেনা সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন নি। তবে সাহাবা কিরাম তাঁর নির্দেশের প্রতি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করতেন। জিহাদে অংশ গ্রহণ করাকে তাঁরা গৌরবজনক বিষয় বলে জানতেন। এমন কি যুদ্ধের ময়দানে বাছাই পর্বে বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তারা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তেন। বয়সে ছোটরা রাসূল (স)-এর সামনে পরস্পর কুস্তি ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরামর্শ করে হারজিতের নমুনা প্রদর্শন করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সম্মতি লাভ করতো। প্রয়োজনের সময় রাসূল (স.) পুরো জাতিকে তলব করতেন। তাঁরা পংগপালের ন্যায় ছুটে এসে সেই আহবানে সাড়া দিতেন।

সাতাশটি যুদ্ধে মহানবী (স.) স্বয়ং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য যুদ্ধে এক একজন প্রতিনিধিকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ করতেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রের অখন্ডতা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। এর কোনটিতেই তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাব ছিল না।

শিক্ষা বিভাগ

পাপ পংকিলতা থেকে মানবতাকে উদ্ধার করে আশরাফুল মাখলূকাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাসূল (স.) মদীনায় আগমন করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পুরুষ-মহিলা যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে। তাঁর প্রতি যে সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় তাতে বলা হয়েছে ঃ 'পড়, তোমার প্রভূর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে জমাট রক্তবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, পড়, তোমার প্রভূ অতি সম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ যা জানত না তাই শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আল-আলাক)।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র

মহানবী (স.) মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করেন। মদীনার মসজিদে নববীর এক কোণে একদল সাহাবী সার্বক্ষণিকভাবে রাসূল (স.)-এর নিকট থেকে নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানপিপাসু এই দলটিকে আহলে সুফ্ফা বলা হতো।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

রাসূল (স.)-এর মহান আদর্শ ছিলো সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য এবং ব্যাপক পরিসরভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সাহাবা কিরামের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সকলের সম্মতিক্রমে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ অনুমোদন করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদীদের মুক্তিদানের ক্ষেত্রে তিনি প্রবীণ সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করার মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা জগৎ ধ্বংস না হওয়া অবধি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. মদীনায় আনসার, মুহাজির, খ্রিস্টান, ইয়াহূদী এবং তাদের মিত্রদের মিলে কী গঠিত হয়েছিল?
২. মদীনা আক্রান্ত হলে সকলেই সমভাবে প্রতিরোধ করবে, এটি কিসের ধারা?
৩. মদীনা সনদ অনুযায়ী যুদ্ধ বা শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কে থাকবেন?
৪. মহানবী (স)-এর সীলমোহর কে সংরক্ষণ করতেন?
৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের অন্যতম দায়িত্ব কী ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মদীনা সনদের সারসংক্ষেপ লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের সমর বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৫. ইসলামী রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মদীনা সনদের ধারাগুলো বর্ণনা করুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও অর্থবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
৩. ইসলামী শিক্ষা ও সমর বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা

পাঠ ঃ ২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ বিচারকের পদ ও বিচারক নিয়োগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ◆ বিচারকের গুণাবলীর বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ বিচারকার্য পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ◆ সাক্ষ্যদাতাদের গুণাবলী উল্লেখ করতে পারবেন।

বিচারকার্য ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হওয়ার উপরই মানব সমাজের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি সর্বতোভাবে নির্ভর করে। কেননা যে সমাজে বিচার নেই, জনগণের ফরিয়াদ পেশ করার কোন স্থান নেই এবং তার প্রতিকার করারও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই তা পাশবিক সমাজ হতে পারে, তা কখনোই মানুষের বাসোপযোগী সমাজ হতে পারে না। মানুষের জন্য শুধু বিচার নয় বরং সুবিচারের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। ফরিয়াদ পেশ করার একটা স্থান থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং তা আন্তরিকতা সহকারে শোনার এবং তার নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকাও একান্ত আবশ্যক। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শুধু বিচারের ব্যবস্থা আছে বলা ঠিক হবে না, এতে আছে সর্বতোভাবে ন্যায়সংগত নিরপেক্ষ ও আদর্শ ভিত্তিক সুবিচার। এ সুবিচার মানুষকে দেয় পূর্ণ মানবীয় মর্যাদা নিয়ে মানব সমাজে বসবাস করার অপূর্ব সুযোগ আর প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করে তার মানবিক ও মৌলিক অধিকার এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতা। পক্ষান্তরে সমাজে যদি বিচারের নামে চলে জুলুম, শোষণ, নির্যাতন, সুবিচার বলতে কোথাও কিছু খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে চারিদিকে অরাজকতা-উচ্ছৃঙ্খলতা মারামারি, হানাহানি, চুরি ডাকাতি দেখা দেয়া অবধারিত এবং তখন পুরো সমাজটাই হয় চরমভাবে বিপর্যস্ত।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচারব্যবস্থা

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন দর্শনে মানুষের ইহ ও পারলৌকিক জীবনের সকল বিষয়ের নির্ভুল ও সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। কাজেই মানব জীবনে রাষ্ট্র যেমন অপরিহার্য বিষয় তদ্রূপ বিচারব্যবস্থাও রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত বিচারক হচ্ছেন আল্লাহ। তাই তাঁর দেয়া বিধান মোতাবেক বিচার-মীমাংসা করা একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ বলেন-

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ .

''কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিস্পত্তি কর।'' (সূরা আল-মায়িদা : ৪৯)

আল্লাহ আরো বলেন-

إِنَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ

"আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ

''তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।'' (সূরা আন-নিসা : ৫৮)

অতএব বিচারকের দায়িত্ব হল জনগণের মধ্যে আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার নিস্পত্তি করা। বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য যেহেতু একটি ফরয প্রতিষ্ঠা করা, সেজন্য বিচারক নিয়োগও নিঃসন্দেহে একটি ফরয কাজ। তাছাড়া মহানবী (স) দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সাহাবীগণকে বিচারক হিসেবে প্রেরণ করতেন। তিনি মুআয

ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামনে এবং আত্তাব ইবনে উসায়দ (রা.) কে মক্কায় বিচারক নিয়োগ করেছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিচারক নিয়োগ রাষ্ট্রপ্রধানের একটি অন্যতম ফরয-কর্তব্য।

আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার না করা কুফরী

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই নিঃশর্তভাবে তাঁর নির্দেশ মান্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিধানই চলবে। এটাই হওয়া উচিত। এহেন অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অপর কারো নির্দেশ মান্য করা কুফরী।

আল্লাহ আরো বলেন-

فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ

''সুতরাং মানুষকে ভয় করোনা, আমাকেই ভয় কর''। (সূরা আল-মায়িদা-৪৪)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে।" (সূরা আন-নিসা : ৬৫)

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার-মীমাংসা করে না এবং নবীর সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারে না তারা কখনও মুমিন হতে পারে না। অন্য দিকে বলা যায়, নবীর সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা দূরে থাক, নবীর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলেও সে মুমিন হতে পারে না।

বিচারকের পদ ঃ যে ব্যক্তি বিচারকার্য পরিচালনায় দক্ষ তাকে বিচারকের পদ প্রদান করা হলে তা গ্রহণ করা তার কর্তব্য। কারণ তিনি অস্বীকৃতি জানালে এবং উক্ত পদে অযোগ্য লোক সমাসীন হলে বিচারকার্য বাধাগ্রস্ত ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। মহানবী (স) স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণও বিচারকের পদ অলংকৃত করেছেন। মহানবী (স) বলেন,

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و ان اجتهد فأخطأ فله أجر .

"বিচারক ইজতিহাদ করে সত্যে উপনীত হলে তার জন্য দিগুণ সওয়াব এবং ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্য একগুণ সওয়াব রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার জন্য দশগুণ সওয়াব রয়েছে।"

বিচারক যখন বিচার নিষ্পত্তির জন্য বসেন তখন আল্লাহ তার নিকট দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে সৎপথ দেখান এবং যথার্থ বিষয় নির্দেশ করেন। তিনি ন্যায়বিচার করলে তারা তাঁর সাথে অবস্থান করেন এবং অবিচার করলে তার প্রতিবাদ করেন এবং তাঁকে ত্যাগ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন-

لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلى من عبادة سبعين سنة .

"বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মাঝে বিচারক হয়ে বসা আমার কাছে সত্তর বছরের ইবাদত অপেক্ষা প্রিয়।"

তবে অযোগ্য ব্যক্তির বিচারকের পদে আসীন হওয়া সমীচীন নয়। মহানবী (স) বলেছেন-

"বিচারক তিন ধরনের। একজন জান্নাতে এবং অপর দু'জন জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধি করে তদনুযায়ী রায় প্রদান করে সে জান্নাতে যাবে। যে ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা প্রসূত রায় প্রদান করে সেও জাহান্নামে যাবে।

বিচারক নিয়োগের শর্তাবলী

বিচারক নিয়োগের শর্তাবলী দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

ক. অপরিহার্য শর্তাবলী

খ. পরিপূরক শর্তাবলী

অপরিহার্য শর্তাবলী ঃ বিচারককে অবশ্যই মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন, চক্ষুষ্মান, শ্রবণশক্তি সম্পন্ন, বাকশক্তি সম্পন্ন এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ প্রদান-এর দন্ড থেকে মুক্ত হতে হবে। কাজেই কাফির,

অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল, অন্ধ, মূক ও বধির ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা বৈধ নয়। হানাফী মাযহাব মতে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ-এর দন্ড ভোগকারীকে বিচারক নিয়োগ করা বৈধ নয়। তবে অন্যান্য মাযহাবের মতে, দন্ড ভোগকারী তাওবা করে সংশোধন হলে তাকে বিচারক নিয়োগ করা যাবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে অপরিহার্য শর্তাবলীসহ সহায়ক শর্তাবলীও পাওয়া যাবে সে বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভে প্রাধান্য পাবে। বিচারকের ন্যায়পরায়ণ হওয়া একটি অপরিহার্য শর্ত। কাজেই যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয় তাকে বিচারক নিযুক্ত না করাই সমীচীন। আর ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার নিয়োগ অবৈধ।

উল্লেখ্য যে, বিচারককে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন জ্ঞানী হতে হবে। অন্যথায় তাকে নিয়োগ করা বৈধ হবে না। এটা একটি পরিপূরক শর্ত বটে।

পরিপূরক শর্তাবলী ঃ অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়াও আরো কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন- আইনের সাথে সম্পর্কিত প্রচলিত প্রথা, ঐতিহ্য ও রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল হতে হবে। তার লোভ-লালসা মুক্ত ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

বিচারকের গুণাবলী

একজন বিচারকের মধ্যে যেসব গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় তার সংখ্যা অনেক। নিম্নে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের উল্লেখ করা হল-

১. বিচারক মোকদ্দমার বিবরণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে শোনবেন এবং তা হৃদয়ঙ্গম করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন। যেমন ওমর ফারুক (রা.) তাঁর এক পত্রে আবূ মূসা আল-আশআরী (র) কে বলেছেন, আপনার নিকট কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য পেশ করা হলে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের বক্তব্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। তা না হলে আপনার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

২. বিচারক বাদী ও বিবাদীর সাথে সমতাপূর্ণ আচরণ করবেন। তিনি উভয় পক্ষকে তার সামনে বসাবেন। এক পক্ষকে ডান পার্শ্বে এবং অপর পক্ষকে বাম পার্শ্বে বসাবেন না। কারণ শরীআতে ডান ও বাম পার্শ্বের মর্যাদায় তারতম্য আছে। একবার ওমর ফারুক (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তিনি ও উবাই ইবনে কাব বাদী ও বিবাদী হিসেবে যায়দ (রা.) এর আদালতে উপস্থিত হলে ওমর (রা) -কে বসার জন্য একটি চেয়ার এগিয়ে দেন। ওমর (র) সাথে সাথে প্রতিবাদ করে যায়দকে বললেন, এ হচ্ছে আপনার প্রথম অন্যায়। অতঃপর তিনি বিচারকের সামনে বসে পড়লেন।

৩. বিচারক সাক্ষীদের সাথে এমন আচরণ করবেন না যাতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ হলে তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদানে অপারগ হয়ে যাবে। ফলে আদালতে সত্য অনুদঘাটিত থেকে যাবে। অনুরূপভাবে তিনি বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষের সাথে এমন আচরণ করবেন না, যার ফলে তার সততা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

৪. বিচারক উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে আদালতে উপস্থিত হবেন এবং আসন গ্রহণের শেষে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকে সালাম দেবেন। তবে তিনি এক পক্ষকে বাদ দিয়ে অপর পক্ষকে সালাম দেবেন না।

৫. বিচারক কোন পক্ষ কর্তৃক প্রভাবিত কিংবা ভীত-সন্ত্রস্ত হতে পারবেন না; বরং তাকে নির্ভীক হতে হবে। অনুরূপভাবে তিনি হবেন বিনয়ী, ভদ্র ও কোমলপ্রাণ। কর্কষভাষী, পাষাণ-হৃদয় ও নিষ্ঠুর হওয়া তার জন্য শোভন নয়।

৬. বিচারক আদালতে এমন কোন কাজ করবেন না যা বিচার কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তিনি মোকদ্দমার রায় ঘোষণার পূর্বপর্যন্ত তা গোপন রাখবেন, অন্যথায় তা কারো দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৭. বিচারক শান্ত মেজাজে মোকদ্দমা পরিচালনা করবেন এবং রায় দেবেন। তার মধ্যে ক্রোধ জাগ্রত হলে কিংবা তার ভীষণ ক্ষুধা কিংবা নিদ্রা-আচ্ছন্ন করে ফেললে অথবা কোন কারণে তার মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করলে তিনি মোকদ্দমা পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকবেন।

৮. রায় প্রদানের দিন তিনি এমন কোন নফল ইবাদতে লিপ্ত হবেন না যার ফলে বিচারকার্যে তার দৈহিক কিংবা মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

৯. বিচারকের আত্মীয়-স্বজন পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করলে তিনি তাড়াহুড়া না করে বরং তাদের মাঝে সমঝোতা স্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। যদি সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব না হয় তবে পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে মোকদ্দমা পরিচালনা করবেন। কারণ আল্লাহ বলেন, والصلح خير "সমঝোতা স্থাপনই উত্তম।" (সূরা আন-নিসা :১২৮)

১০. বিচারক নিজ আত্মীয় অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অপর কারো নিকট হতে অর্থকড়ি বা অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না। অনুরূপভাবে তিনি নিজ আত্মীয় ব্যতীত অপর কারো নিকট হতে উপহার-হাদিয়া গ্রহণ করতে পারবেন না। বিবদমান কোন পক্ষ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করলে তা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নবী (স) বলেছেন ঃ

هدايا العمال سحت .

"সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকন অবৈধ মাল হিসেবে গণ্য।"

১১. বিচারক বাদী অথবা বিবাদীর ভোজ সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে কোন ভোজ সভায় বাদী ও বিবাদী অংশগ্রহণ করলে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

১২. বিচারককে জ্ঞান-গরিমার দিক থেকেও প্রজ্ঞাবান হতে হবে। বিশেষত আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

বিচারকার্য পরিচালনার মূলনীতি

বিচারকার্যে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বিচারককে সর্বপ্রথম আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। এজন্য তাকে অবশ্যই কুরআনের বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আল-কুরআনের পর প্রয়োজনবোধে সুন্নাহ মোতাবেক ফয়সালা করতে হবে। এ জন্য বিধান সম্বলিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে বিচারকের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কুরআন ও সুন্নায় কোন সমাধান পাওয়া না গেলে বিচারককে মহানবী (স)-এর সাহাবীগণের ইজমা'র শরণাপন্ন হতে হবে। একই বিষয়ে সাহাবীগণের বিভিন্ন মত থাকলে বিচারক তার প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিবেন। কিন্তু বিচারক সকলের মতামত ত্যাগ করে তার নিজস্ব মত অনুযায়ী রায় প্রদান করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারো কারো মতে, এক্ষেত্রেও বিচারক দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। কোন রায় কোন বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে বিদ্যমান না থাকলে এবং সে বিষয়ে তাবেয়ীগণের ইজমা প্রসূত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে বিচারক তদনুযায়ী মীমাংসা করবেন। তবে কোন বিষয়ে তাবেয়ীদের কোন অভিমত না থাকলে এবং বিচারক ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হলে একান্তই যথার্থ সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য ইজতিহাদ করে রায় প্রদান করবেন। তিনি যদি মুজতাহিদ না হন, তবে মুজতাহিদ আলিমগণের সাথে পরামর্শ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে আদৌ লজ্জাবোধ করবেন না।

উল্লেখ্য যে, বিচারকের রায় প্রদানের পর যদি দেখা যায় যে, তা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী তবে উক্ত রায় বাতিল বলে গণ্য হবে।

মহিলা বিচারক নিয়োগ

হানাফী মাযহাব মতে দেওয়ানী বিষয়ে মহিলা বিচারক নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু দন্ডাদেশ বিষয়ে মহিলা বিচারক নিয়োগ করা যাবে না। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র) বলেন, সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে মহিলা বিচারক নিয়োগ করা বৈধ। তবে হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবে মহিলা বিচারক নিয়োগ করা বৈধ নয়।

পাপী ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ

পাপী ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা বৈধ। ইসলামী শরীআতের সীমা লংঘন না করলে তার রায় কার্যকর হবে। তবে পাপীকে বিচারক নিয়োগ না করাই শ্রেয়। ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমাদ (র)-এর মতে পাপী ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা বৈধ নয় এবং তার রায়ও কার্যকর হবে না। কোন ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হওয়ার পর পাপ কার্যে লিপ্ত হলে সে বরখাস্ত হবে এবং তাকে অপসারণ করানো সরকারের কর্তব্য।

বিচারকের বেতনভাতা

মহানবী (স) বলেছেন, "আমরা কোন ব্যক্তিকে সরকারী কাজে নিয়োগ দিলে এবং তার বাসস্থান না থাকলে তার জন্য ব্যবস্থা করব, তার খাদেম না থাকলে আমরা তার ব্যবস্থা করব, তার স্ত্রী না থাকলে আমরা তার বিবাহের ব্যবস্থা করব। মহানবী (স) তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় যাদেরকে নিয়োগ প্রদান করেছেন তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পরবর্তী চার খলীফার সময়ও এ প্রথা বহাল ছিল।

বিচারক যদি সচ্ছল হন এবং বায়তুলমাল থেকে কোন প্রকার বেতন-ভাতা গ্রহণ না করেও চলতে পারেন তবে তা গ্রহণ না করাই উত্তম। তবে তার নিজের এবং তার কর্মচারীদের যে কোন অবস্থায় বেতন-ভাতা গ্রহণ করা

বৈধ, এমনকি ছুটির দিনের বেতন-ভাতা গ্রহণ করাও বৈধ। বিচারক তার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণও বায়তুলমাল থেকে পাবেন।

বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল

বিচারকের রায় যদি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা ভিত্তিক হয়ে থাকে এবং উচ্চতর আদালতের পর্যালোচনায় যদি দেখা যা যে, তা উপরিউক্ত উৎসসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তবে পূর্বোক্ত রায় বহাল থাকবে। কিন্তু এর বিপরীত হলে উচ্চতর আদালত অবশ্যই উক্ত রায় বাতিল ঘোষণা করে সঠিক রায় প্রদান করবে।

বিচারকের রায় যদি ইজতিহাদী গবেষণাধর্মী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং একই বিষয়ে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে যে কোন মত অনুসরণ করার ব্যাপারে বিচারকের স্বাধীনতা থাকবে। মোটকথা বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ ইসলাম সম্মত।

বিচারকের দায়িত্বের অবসান

নিম্নোক্ত কারণে বিচারকের দায়িত্বের অবসান ঘটবে-

১. বিচারকের চাকুরীর মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেলে। তবে নিয়োগদাতা মেয়াদ বাড়ালে স্বতন্ত্র কথা।

২. বিচারক স্বপদে ইস্তফা দিলে এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে। পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে এবং এ সময়ে প্রদত্ত তার রায় কার্যকর হবে।

৩. বিচারক উৎকোচ গ্রহণ করলে এবং তা প্রমাণিত হলে।

৪. বিচারক পাগল হয়ে গেলে। কারণ পাগলের পক্ষে বিচারকের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

৬. বিচারক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়লে।

৭. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে।

সাক্ষ্য প্রদান

বিচারকার্য সঠিকভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সাক্ষীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষ্যদাতার নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা একান্ত প্রয়োজন-

১. সাক্ষ্যদাতাকে বোধশক্তিসম্পন্ন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।

৫. সাক্ষ্যদাতাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

৬. সাক্ষ্যদাতাদের সংখ্যা কমপক্ষে দু'জন হতে হবে।

৭. সাক্ষ্যদাতাকে 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি' শব্দযোগে সাক্ষ্য দিতে হবে।

৮. যে বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া হবে সে বিষয়ে সাক্ষীগণের জ্ঞান থাকতে হবে।

৯. আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে।

১০. সাক্ষ্যদাতা প্রতিপক্ষের শত্রু হতে পারবে না।

১১. সাক্ষ্যদান নিঃস্বার্থ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

যে সকল লোকের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য

১. পিতামাতার অনুকূলে সন্তানের সাক্ষ্য

২. সন্তানের অনুকূলে পিতামাতার সাক্ষ্য

৩. স্ত্রীর অনুকূলে স্বামীর সাক্ষ্য

৪. স্বামীর অনুকূলে স্ত্রীর সাক্ষ্য

৫. অপ্রাপ্ত বয়স্কের সাক্ষ্য

৬. পাগলের সাক্ষ্য

৭. মিথ্যুক হিসেবে পরিচিতি ব্যক্তির সাক্ষ্য

৮. সূদখোর ব্যক্তির সাক্ষ্য

৯. ফরয ত্যাগকারীর সাক্ষ্য

১০. যে বিষয় দেখার সঙ্গে সম্পর্কিত সেক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য

১১. বোবা ও বধির ব্যক্তির সাক্ষ্য

মহিলার সাক্ষ্য

১. দন্ড ও হত্যার ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২. দন্ড ও হত্যা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।
৩. বংশ প্রমাণ, দুধপান সংক্রান্ত প্রমাণ এবং মহিলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন মহিলার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

সারকথাঃ ইসলামী বিচারব্যবস্থা একটি কল্যাণকর ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ বিনির্মাণে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। মহানবী (স) খুলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসন কালের বিচারব্যবস্থা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা এখানে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচারব্যবস্থা, বিচারকের পদ, বিচারক নিয়োগের শর্তাবলী, বিচারকের গুণাবলী, বিচারকার্য পরিচালনার মূলনীতি, মহিলা বিচারক নিয়োগ, পাপী ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ, বিচারকের বেতন-ভাতা, বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল, বিচারকের দায়িত্বের অবসান এবং সাক্ষ্যদান বিষয়ে জানতে পেরেছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক বিচার করেন-
ক. আল্লাহর বিধান মোতাবেক; খ. প্রধান বিচারপতির মতানুযায়ী;
গ. কাজীর মতামত অনুসারে; ঘ. রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী।

২. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার না করা-
ক. কুফরী; খ. মোনাফেকী;
গ. অন্যায়; ঘ. উপরের সবগুলো উত্তর সঠিক।

৩. বিচারকের শর্তাবলী দুই'ভাগে বিভক্ত-এর একটি হল
ক. সাধারণ শর্তাবলী; খ. পরিপূরক শর্তাবলী;
গ. কঠিন শর্তাবলী; ঘ. সহজ শর্তাবলী।

৪. ''মহিলা বিচারক নিয়োগ বৈধ'' এটি কার মাযহাব?
ক. ইমাম শাফেঈ (র)-এর; খ. ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর
গ. হযরত উমর (রা)-এর; ঘ. হযরত ইমাম মালিক (র)-এর।

৫. পাপী ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা ইমাম শাফেয়ীর মতে-
ক. বৈধ; খ. অবৈধ;
গ. শ্রেয় নয়; ঘ. করা যাবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
২. প্রমান করুন ''আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য না করা কুফরী''।
৩. বিচারক নিয়োগের শর্তাবলী সংক্ষেপে লিখুন।
৪. বিচারকের গুণাবলীর মধ্য হতে ৫টি গুণাবলী লিখুন।
৫. বিচার কাজ পরিচালনার মূলনীতি আলোচনা করুন।
৬. সাক্ষ্যদাতার জন্য অপরিহার্য ৭টি গুণের উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. বিচারক নিয়োগের শর্ত এবং বিচারকের গুণাবলী বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. সাক্ষ্যদাতার গুরুত্ব আলোচনাসহ সাক্ষ্যদাতার গুণাবলী কি কি? লিখুন।

ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থা

পাঠ ঃ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক প্রধানের কাজ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

সামরিক ব্যবস্থার গুরুত্ব

প্রত্যেক স্বাধীন জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব তার সামরিক বিভাগের উপর নির্ভরশীল। যে জনগোষ্ঠী শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে যতবেশী সক্ষম ও শক্তিশালী, তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ততো বেশি সুসংহত। এদিক থেকে প্রত্যেকটি স্বাধীন জনগোষ্ঠীর জন্য একদল সুদক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে শত্রুমুক্ত করা এবং স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তে জীবন যাপনের নিশ্চয়তাদানই সামরিক বাহিনীর একমাত্র কাজ। জনগণ ও দেশের স্বাধীনতার বিশ্বস্ত প্রহরী হচ্ছে সামরিক বাহিনী। কাজেই এ বিভাগের গুরুত্ব খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

সামরিক তৎপরতার লক্ষ্য

ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী প্রকৃতপক্ষে দেশ, জাতি ও জাতীয় আদর্শের অতন্দ্র প্রহরী। তারা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে সদা নিয়োজিত থাকে। মূলত তারা দীনের মুজাহিদ। ইসলামের প্রাথমিক এবং পরবর্তী সময়ের ইসলামী জীবনধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে বেগ পেতে হবে না যে, মুসলমানদের সামরিক তৎপরতা কত অনন্য। বস্তুত কুরআন মাজীদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় সামরিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলেছে এবং এর বাস্তব দিক সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ ও অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান এবং সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত থাকার বিষয়ে ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে।

আল্লাহ বলেন-

ٱنْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

"অভিযানে বেরিয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী অবস্থায় এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে!" (সূরা আত-তাওবা : ৪১)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَجَاهِدُوا فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ .

"এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে, যেভাবে জিহদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮)

এ জিহাদের নির্দেশ সর্বপ্রথম এসেছিল মহানবী (স) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি। তাঁরা এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। তবে এ নির্দেশ সর্বজনীন। পৃথিবীতে যতদিন ঈমানদার লোকদের অস্তিত্ব আছে, ততো দিন কুরআন আছে আর যতদিন কুরআন আছে ততোদিন জিহাদের নির্দেশও আছে। মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন-

وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً .

"যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" (সূরা আন-নিসা : ৯৫)

ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র মুসলমানই হচ্ছে সেই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, বর্তমান যুগে দুনিয়ার প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রেই একটা সুসংগঠিত সেনাবাহিনী রয়েছে। তারা দিবানিশি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকে আর তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে জাতীয় বাজেটের শতকরা আশি ভাগ। এরা এমনি একটি পেশাদার সেনাবাহিনী যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এহেন তৎপরতা কাম্য নয়। তবে বর্তমান চাহিদা অস্বীকার

করা যায় না। মোটকথা ইসলামে সামরিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য দেশ দখল নয়, জাতির পর জাতিকে গোলাম বানানো নয়। এক কথায় বলতে গেলে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতিরক্ষাই হচ্ছে সামরিক তৎপরার একমাত্র লক্ষ্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

- ইসলামী দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা।
- পরাধীন ও দুর্বল লোকদেরকে স্বৈর শাসনের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করা যেন তারা নিজেদের পছন্দমত যে কোন জীবন বিধান বা ধর্ম গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়।

প্রথম প্রকারের সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে ঃ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আলে-ইমরান: ২০০)

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের সামরিক তৎপরতা চালাবার জন্য কুরআন মাজীদ বিশেষভাবে আহবান জানিয়েছে।

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً .

"তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্য, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এই জনপদ-যার অধিবাসী যালিম, তা হতে আমাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী পাঠাও।" (সূরা আন-নিসা : ৭৫)

মুসলিম মুজাহিদগণ যখন তদানীন্তন পারসিকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন তখন পারসিক রাজা রুস্তম তাদের আক্রমণের লক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মুসলিম বাহিনীর মুখপাত্র বলেছিলেন,

"আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের মত বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর বান্দা বানিয়ে দেয়া, একমাত্র আল্লাহর বান্দা হয়ে জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়া।"

সামরিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করণের উপায়

সামরিক ব্যবস্থার ব্যাপারে শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা এবং তার মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্রের একান্ত করণীয়। এক কথায় বলা যায়, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা ও গাফিলতি প্রদর্শন কিংবা অসতর্ক থাকা ক্ষমাহীন অপরাধ। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

মনোবল ও মানসিক শক্তি চাঙ্গা রাখা

প্রতিরক্ষার কথা চিন্তা করলেই সর্বাগ্রে আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে সামরিক বাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্রের বিপুল সম্ভার ও বৈষয়িক সাজ-সরঞ্জামের কথা। মনে করা হয়, এগুলো পুরোপুরি বিদ্যমান থাকলে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই, আর এগুলোর ব্যবস্থা না হলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমরবিদদের মতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জনগণের মনোবল ও মানসিক শক্তি, তারপর নৈতিক শক্তি এবং সর্বশেষে অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের শক্তি। তাদের মতে-বস্তুগত শক্তির অপ্রতুলতার কারণে পরাজয়ের ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ হয়ে থাকে মূলতঃ মানসিক ও নৈতিক শক্তির দুর্বলতার কারণে। মানসিক ও নৈতিক শক্তির অধিকারী জাতিগুলো জয়ী হয় সেসব জাতির উপর যারা মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, যদিও তাদের বৈষয়িক শক্তির বিপুলতা বিরাজিত। ইসলামের ইতিহাসে এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদে আছে-

فَإِن يَكُنْ مِّنكُمْ مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ .

"এবং তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল একশতজন থাকলে তারা দুই'শত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহর সাহায্যে তারা দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আনফাল : ৬৬)
অন্যত্র আছে-

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা আলে- ইমরান : ১৩৯)

ঐক্য ও শৃঙ্খলা অটুট রাখা

নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়া সেনাবাহিনীর ধারণাই করা যায় না। মনীষী সক্রেটিস বলেছেন-
"সেনাবাহিনীর জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলার সুষ্ঠুতা একান্ত অপরিহার্য। শৃঙ্খলাহীন সেনাবাহিনী মানুষের একটা ভীড় মাত্র। ইট, চুনা, বালু ও অন্যান্য সামগ্রী যেমন আপন হতেই ইমারত নির্মাণ করে দেয় না, অনুরূপভাবে জনতার কোন ভীড়ও 'সেনাবাহিনী' নামে অভিহিত হতে পারে না।"

বস্তুত সেনাবাহিনী যতই সুসংগঠিত ও সুসংহত হবে তা ততো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কোন জাতির সেনাবাহিনী যদি সুশৃঙ্খল হয় তাহলে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। পক্ষান্তরে কোন জাতির মধ্যে বিরোধ ও প্রতিহিংসা যদি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে তাহলে শুধু এ কারণেই একটি জাতির ললাটে পরাজয়ের কালিমা লেগে যেতে পারে। তাই সেনাবাহিনীকে ঐক্য বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন . ورابطو 'তোমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাক'। (সূরা আলে-ইমরান-২০০)

কুরআন মাজীদে আরও এসেছে-
"হে মুমিনগণ ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। বিবাদ করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-আনফাল : ৪৫-৪৬)

শত্রুর মোকাবিলায় বৈষয়িক শক্তি অর্জন ঃ

যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম এবং উপযুক্ত যান-বাহনের পুরোপুরি ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। কুরআন মাজীদে এ পর্যায়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ .

"তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে এবং এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদের বিষয় তোমরা জান না, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে অবহিত আছেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অবিচার হবে না।" (সূরা আল-আনফাল: ৬০)

শত্রুর হামলা হতে রক্ষা করতে পারে এমন সর্বপ্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র তা যাই হোক না কেন- সংগ্রহ করা এবং তা দ্বারা সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করে সদা প্রস্তুত রাখারই নির্দেশ অত্র আয়াতে প্রদান করা হয়েছে।

সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকই সামরিক বাহিনীর সদস্য। রাষ্ট্র যদি কখনো কোন শত্রু-রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন সাধারণভাবে সকলের উপর আল্লাহর এই নিদের্শের বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ .

"তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যারা করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯০)

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ جَمِيعاً .

"হে মুমিনগণ ! সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একত্রে অগ্রসর হও।" (সূরা আন-নিসা : ৭১)

শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা প্রতিরক্ষার দৃষ্টিতে অতীব জরুরি কাজ। এ পর্যায়ে মহানবী (সা.) বলেছেন-

رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها .

"আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া সমগ্র দুনিয়া ও তার উপরে অবস্থিত সব জিনিস হতে উত্তম।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার গুরুত্ব এত বেশি এ কারণে যে, দেশ রক্ষার সাথে সাথে ইসলামের হিফাযতের বিষয়টিও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। একাজ সকল মুসলমানের স্থায়ী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যখন সাধারণ ঘোষণা দেয়া হবে যে, দেশ আক্রান্ত হয়েছে এবং জনগণকে তাতে যোগদান করার জন্য সাধারণভাবে আহবান জানান হবে তখন যুদ্ধে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের তাতে যোগদান করা ফরযে আইন হয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সাথে সাথে যাবতীয় দুর্যোগ সফলভাবে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রতিটি মুসলমানকে একজন সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে কাজ করতে হবে। মহানবী (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী না থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমান মুজাহিদ স্বতঃস্ফ র্তভাবে রণাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন। মহানবী (সা) স্বয়ং ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। সৈন্যগণ ছিলেন পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও বর্মধারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. দেশের স্বাধীনতার বিশ্বস্ত প্রহরী হচ্ছে-
ক. সাধারণ জনগণ; খ. রাষ্ট্রপ্রধান;
গ. সংসদ; ঘ. সামরিক বাহিনী।

২. সামরিক বাহিনী-
ক. একটি দেশের প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকে; খ. দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখে;
গ. প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে; ঘ. উপরের সবক'টি উত্তরই সঠিক।

৩. শৃঙ্খলাহীন সেনাবাহিনী মানুষের একটা ভিড়মাত্র- এটি কার কথা?
ক. গৌতম বুদ্ধের; খ. বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের;
গ. দার্শনিক সক্রেটিসের; ঘ. হযরত আলী (রা)- এর।

৪. আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়ার মূল্য-
ক. আখেরাতের সব কিছু থেকে উত্তম; খ. দুনিয়া এবং এর উপর যা আছে সব কিছু হতে উত্তম;
গ. দুনিয়া থেকে উত্তম; ঘ. দুনিয়া-আখেরাত সব কিছু থেকে উত্তম।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে সামরিক ব্যবস্থার গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের উপায়গুলো লিখুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রে সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

ইসলামী রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা

পাঠ ঃ ৪

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শিক্ষা বিস্তারে মহানবী (স) -এর পদক্ষেপগুলো তুলে ধরতে পারবেন;
- খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

যে শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে প্রতিভাত করে তাই ইসলামী শিক্ষা। মধ্যযুগে ইসলামের অভ্যুদয় মানব ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী ঘটনা। এ যুগের শিক্ষা মুসলমাদের অবদানে উজ্জ্বল। বর্তমানকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিও তাঁদের অবদানের ফসল। তাই বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানদের নিকট ঋণী।

মধ্যযুগে মুসলমানদের অবদানের একটি বিশিষ্ট দিক হল যে, তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের পাশাপাশি প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে ছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এমনকি ভারতবর্ষ থেকেও অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে অনুবাদের মাধ্যমে ঐ সব অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ করেন।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্বঃ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের উৎস কুরআন হল মুসলিম বিশ্বের মূল শিক্ষাগ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিধান থেকে শিক্ষা বাদ যায়নি। বরং এ গ্রন্থের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় শিক্ষার দু'টি মাধ্যমের উল্লেখ করে। তা হল পড়া ও লেখা।

মহান আল্লাহর বাণী-''(হে নবী) পড়ুন, আপনার প্রতিপলকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্ত পিন্ড থেকে। পড়ুন, আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।'' (সূরা আল-আলাক ১-৪)

বিদ্বান ও বিদ্বাহীনদের সম্পর্কে কুরআনের বাণী হল– ''হে নবী! আপনি বলে দিন, যারা ইলম শিক্ষা করেছে আর যারা ইলম শিক্ষা করে নি, এ উভয় দল কি সমান হতে পারে ?'' (সূরা আয-যুমার:৯) বিদ্বাহীন ব্যক্তি পশুর সমান। আর বিদ্বান ব্যক্তি সমাজের আলোকবর্তিকা। বিদ্বান ও মূর্খের পার্থক্য আলো ও অন্ধকারতুল্য।

শিক্ষা বিস্তারে মহানবী (স.) যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো

নবীগৃহকে শিক্ষাগারে পরিণত করা

হযরত মুহাম্মাদ (স.) নবুওয়াত লাভের পর থেকে তাঁর গৃহকে শিক্ষাগার হিসেবে প্রস্তুত করেন। নবী করীম (স.) নিজে লোকদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা.) আজীবন শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর মদীনায় তাঁর স্ত্রীদের গৃহ নারীদের শিক্ষা দানের জন্য ছিল উন্মুক্ত। হযরত আয়িশা (রা.), হাফসা (রা.) ও উম্মে সালামা (রা.) নারীদের মাঝে শিক্ষাদান কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

দারুল আরকামে শিক্ষা গ্রহণ

নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায় মক্কায় নিরিবিলি স্থানে অবস্থিত হযরত আরকাম (রা.)-এর বাড়ি (দারুল আরকাম)-কে একটি শিক্ষায়তনে পরিণত করেন। এখানে মুসলিমগণ একত্র হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। যারা নতুন মুসলমান হতেন, তারা গোপনে এসে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। দারুল আরকাম হল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিক্ষায়তন।

গোত্রে গোত্রে শিক্ষায়তন স্থাপন

নতুন কোন গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করলে, তাদের শিক্ষাদানের জন্য অভিজ্ঞ সাহাবীদেরকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হতো। এভাবে গোত্রে গোত্রে বিভিন্ন সাহাবীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষায়তন গড়ে উঠতে থাকে।

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র স্থাপন

হিজরতের পর মসজিদে নববীকে শিক্ষার প্রধানকেন্দ্র হিসেবে রূপ দেয়া হয়। মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে আসহাবে সুফ্ফার জন্য একটি আবাসিক শিক্ষায়তন গড়ে তোলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষ এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতেন। অনেক সাহাবী এ শিক্ষালয়ের আজীবন আবাসিক ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা মুসলমানদের দানে ও বায়তুলমালের থেকে দেয়া হতো। কুফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর, রোম, পারস্য প্রভৃতি স্থান থেকে আগত শিক্ষার্থীরা মদীনায় এসে ভীড় জমাতেন।

মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষা

মহানবী (স.) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, বদরের শিক্ষিত যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন, কয়েকজন নিরক্ষর মুসলিমকে শিক্ষা দান করার মাধ্যমে।

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি

শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে মানুষকে আগ্রহান্বিত করে তোলার জন্য রাসূলুল্লাহ(স.) অগণিত হাদীসে ইহ ও পরকালীন কল্যাণের শুভ সংবাদ ও সফলতার কথা উল্লেখ করেন।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের শিক্ষা ঃ

আল-কুরআনের বাণীর আলোকে মহানবী (স.) যে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেন, তাঁর সাহাবীদের এবং পরবর্তী খলীফাদের হাতে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। মহানবী (স.)-এর ইন্তিকালের পর যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় তাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল বলা হয়। এ আমলের চারজন খলীফা হলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে নতুন রাজ্য বিজিত হয়। বিজয়ী মুসলমানগণ ভিন্নতর শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসেন এবং নতুন সমস্যার মুখোমুখি হন। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায়। কাজেই শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন অধিক হারে অনুভূত হয়। তাই ধর্মীয় জ্ঞান অনুশীলন ও কুরআন হাদীসের নির্দেশ পালন ছাড়াও শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী ব্যাপক ভিত্তিক করা হয়। বিজিত অঞ্চলে নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হয় এবং মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা চালু হয়। তাই বলা যায় যে, প্রয়োজনের তাগিদ এবং মহানবী (স.)-এর সম্পাদিত প্রতিটি কাজ দেখাশুনার পবিত্র দায়িত্ব পালনকল্পে খলীফাগণ শিক্ষা ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছিলেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.)-এর অবদান

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা। তাঁর খেলাফতকাল ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। তিনি কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি মক্কার বিদ্বানদের অন্যতম ছিলেন।

ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করলে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে মাধ্যমে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর উদ্যোগে মহান কাজ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু বকর (রা.) নতুন নতুন মসজিদ স্থাপন করেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদে জ্ঞান বিস্তারের জন্য অনেক আলেমকে নিয়োগদান করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী পাথর, কাপড়, কাঠ, চামড়া ও পাতায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথমে এগুলোকে একত্র করে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তিনি প্রথম ইজতিহাদ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করেন এবং ফিকাহ সম্পর্কে অনেক কঠিন প্রশ্নোত্তর এবং স্বপ্নের সর্বাপেক্ষা নির্ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। তিনি নামাযের ইমামতি করার সময় খোতবায় শিক্ষামূলক আলোচনা করতেন এবং কুরআন শুদ্ধ করে পঠনের জন্য কারী নিয়োগ করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর আমলে আরো প্রসার লাভ করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)-এর অবদান

খলীফা হযরত ওমর (রা.) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ) প্রায় দশ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ও মাদ্রাসা তাঁর আমলেই প্রসার লাভ করে। তিনি শিক্ষকগণকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে সেনানায়ক নিয়োগ করে শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

তখন মক্তবে কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে লিখন ও সাধারণ অংক শিক্ষা দেয়া হতো। লিখন ও অশ্ব চালনা শেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়। বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ এবং আরবী সাহিত্য পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো।

শিক্ষকগণকে ভাষায় সুপন্ডিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের জন্য আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন বিধায় তিনি ভাষা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা নেন। হাদীস শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি কয়েকজন সাহাবীকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান। হযরত উমর (রা.)-এর আমলে রাজ্যের বড় বড় শহরগুলোতে শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে। মক্কা, মদীনা ছাড়াও কুফা, বসরা, দামেস্ক, ফুস্তাত প্রভৃতি স্থান শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে।

একজন বিশিষ্ট ফকীহ হিসেবে তিনি ফতোয়া দিতেন। ফিকাহ ও ইসলামী আইন-কানুন শেখানোর জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে নামকরা শিক্ষক প্রেরণের বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) শুক্রবারের খোতবায় ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। তিনি বেদুঈনদের শিক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুশাসক হযরত উমর (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ছাড়া ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে না। তাই তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)-এর অবদান

হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রীঃ) ইসলামের তৃতীয় খলীফা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আমলে তিনি অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কুরআনের নির্ভুল ও ধারাবাহিক সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। কুরআনের বিভিন্ন উপভাষায় লিপিবদ্ধ কপি পুড়ে ফেলা হয়।

হযরত উসমান (রা.) রাজ্যের বিখ্যাত মসজিদগুলোতে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখেন। কুরআন-হাদীস শিক্ষাদানের সাথে সাথে অংক, কাব্য চর্চা ও কবিতা পাঠের আসর বসত। তিনি মদীনা মসজিদের সংস্কার ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

শিক্ষায় হযরত আলী (রা.)-এর অবদান

খলীফা হযরত আলী (৬৫৬-৬৬১ খ্রীঃ) বলেন, বিত্তের চেয়ে বিদ্যা উত্তম, বিত্তকে তুমি পাহারা দাও, কিন্তু বিদ্যা তোমাকে পাহারা দেয়, বিত্ত খরচে কমে যায়, বিদ্যা বিতরণে বেড়ে যায়। তিনি ইসলামের চতুর্থ ও সর্বশেষ খলীফা। যুদ্ধে বীরত্বের জন্য তিনি আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত হন। অন্য দিকে হযরত আলী (রা.) অসাধারণ পান্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞান গরিমার অধিকারী ছিলেন। সুশিক্ষিত হযরত আলী (রা.) একজন ওহী লেখকও ছিলেন। তাঁর আরবী ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর রচিত 'দীওয়ানে আলী' আরবী সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। তিনি কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও সূরার ব্যাখ্যাদানে দক্ষ ছিলেন।

তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়। তাঁর আমলে কুফার জামে মসজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। তিনি নিজেই এখানে শিক্ষার্থীদের কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন।

হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম হাদীস লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর হাদীস গ্রন্থ সহীফা নামে পরিচিত। তিনি একজন স্বভাব কবি ছিলেন। যুদ্ধ বিষয়ের উপর তাঁর বহু কবিতা রয়েছে। তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রেরণাদানের জন্য দুই হাজারেরও বেশী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করেন।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ইসলামী গণতন্ত্রের যুগ। এ যুগ ইসলামের সোনালী যুগ। এ যুগ মসজিদ ভিত্তিক, মক্তব ভিত্তিক শিক্ষার যুগ। এ আমলেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের সূত্রপাত হয়। আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়। কুরআনের শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রবর্তিত হয়। এ সব মিলিয়ে শিক্ষার পথ সুগম হয় এবং পরবর্তী শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত হয়।

উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

উমাইয়া শাসন আমল ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। উমাইয়া বংশের ১৪ জন খলীফার মধ্যে খলীফা আবদুল মালেক, প্রথম ওয়ালীদ ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উমাইয়া বংশের খলীফাগণ রাজ্য বিজয় এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন।

উমাইয়া বংশের প্রথম খলীফা আমীর মুআবিয়া (রা.) ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে খলীফা আবদুল মালেকের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আরবি ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করেন। তাঁর অন্য অবদান হল আরবি বর্ণমালার লিখন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন। আরবির সহজতর পঠন ও লিখনের জন্য তিনি হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এর সহযোগিতায় আরবী বর্ণমালায় হরকত ও নোকতা প্রবর্তন করেন। এর ফলে আরবী ভাষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) শিক্ষার একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বৃত্তি এবং শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণে উদারনীতি গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দেন। একজন শাসককে তিনি লিখেছিলেন ঃ ছাত্রদের জন্য বৃত্তি নির্ধারিত করে দাও, যাতে তারা আর্থিক দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে শিক্ষালাভে মনোযোগী হতে পারে। হাদীস সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করা তাঁর শাসন আমলের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল কীর্তি। তিনি মদীনার গভর্নরকে লিখে পাঠান, ''মহানবী (স) -এর হাদীসগুলো একত্রকরণে ব্যবস্থা করুন। আমি জ্ঞানী ও জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয় করছি।'' তিনি এ চিঠির কপি রাজ্যের সর্বত্রই পাঠিয়ে দেন। এমনকি বর্ণিত আছে, তিনি এ চিঠিতে সাহাবা ও তাবেঈদের জ্ঞান সম্পর্কিত মতামত ও বাণীও গ্রন্থায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরই আগ্রহ ও আনুকূল্যে একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়।

উমাইয়া যুগে সাম্রাজ্যের মসজিদগুলো ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র এবং কুরআন-হাদীসকে ভিত্তি করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ সময় মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা এবং মিসর প্রধান প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে। তখন তীর চালনা, সাঁতার কাটা এবং আরবি পড়তে ও লিখতে জানলেই তাকে শিক্ষিত বলা হতো। কুরআন পাঠকারীগণ (কারীগণ) ছিলেন ইসলামের আদি শিক্ষক। খলীফা আব্দুল মালেকের সময় গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার প্রথা শুরু হয়। আবদুল মালেক ও ওয়ালীদ সাম্রাজ্যে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। উমাইয়া আমলে আরবি ইতিহাস ও বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা শুরু হয়। গ্রীক ও কপটিক ভাষায় লিখিত রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসা ও ফলিত জ্যোর্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলী আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মুতাযিলাদের যুক্তিবাদী আন্দোলন এ আমলে শুরু হয়। এ যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে সারা দেশে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোটকথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন যা আব্বাসীয় আমলে সম্ভব হয়েছিল তার বীজ উমাইয়া আমলে বপণ করা হয়।

আব্বাসীয় আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা

আব্বাসীয় খিলাফত ৭৫০ হতে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এ বংশে মোট ৩৫/৩৭ জন খলীফা ছিলেন। আব্বাসীয়গণ সুদীর্ঘ ৫০৯ বছরের রাজত্বকালে পূর্বেকার ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। রাষ্ট্রীয় নীতিতে আব্বাসীয়গণ উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। তাঁরা উমাইয়াদের আরব পৃষ্ঠপোষকতা নীতির পরিবর্তে সকল শ্রেণীর মুসলমানের সমান অধিকারের সুযোগ দেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিট্টির উক্তি The Uimayyads were Arabs, the Abbasids were more international. আব্বাসীয়দের উদার মনোভাবের প্রতিফলন শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিদৃশ্যমান ছিল। তাঁরা গ্রীক, রোমান, পারসিক এমনকি ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণে পিছ পা হননি। বলা হয়ে থাকে যে, উমাইয়া যুগ ছিল রাজ্য জয়ের যুগ আর আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে মুসলমানদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও জ্ঞানানুশীলন বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল।

আব্বাসীয় বংশের প্রথম দিকের তিনজন খলীফা হলেন মনসুর, হারুন এবং মামুন। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আব্বাসীয় খলীফাগণের আমলে কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, হাদীস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে বহু নতুন আবিষ্কার দ্বারা মুসলমান পন্ডিতগণ মানব জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করেছিলেন। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আব্বাসীয় খলীফা মনসুর, হারুন এবং মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রীক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃতি প্রভৃতি ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। খলীফা মনসুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে স্কুল-কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি অনুবাদ কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর আমলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ হয়। খলীফার আদেশক্রমে ভারতীয় গল্পগ্রন্থ হিতোপদেশ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। এ ছাড়া গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল, ইউক্লিড, টলেমী প্রমুখ গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞগণের সারগর্ভ গ্রন্থরাজি অন দিত হয়ে মুসলিম জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। খলীফা আল-মনসুরের আমলে সূচিত এ অনুবাদ কার্যক্রম হারুনের আমলেও অব্যাহত থাকে যার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় খলীফা মামুনের আমলে বায়তুল হিকমা (বিজ্ঞানাগার) স্থাপনের মাধ্যমে।

আব্বাসীয় খলীফাগণ শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমী স্থাপন করেন। খলীফা মামুন বাগদাদে একটি কলেজ নির্মাণ করেন। এরপর নিজামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ হতে আগত বহু শিক্ষানবীশ এখানে অধ্যয়ন করতো।

আব্বাসীয় আমলে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি হয়। আরব ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনার গতানুগতিক রীতি পরিত্যাগ করে সমালোচনা ও তুলনার মাধ্যমে এর বৈজ্ঞানিক রূপদান করেন। এ সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রেও মুসলমানগণ অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এ আমলের বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনকারী চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হলেন, আল-রাজী ও ইবনে-সিনা। গণিত শাস্ত্র, ভূগোল শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, দর্শনশাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে আব্বাসীয়গণ অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষার দু'টি স্তর ছিল-প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয় মসজিদ বা ব্যক্তিগত গৃহে গড়ে উঠে। গঠন, লিখন, ব্যাকরণ, হাদীস, প্রাথমিক গণিত, কবিতা প্রভৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। এ সমস্ত বিষয় মুখস্থ করার উপর বেশী জোর দেয়া হতো। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা কুরআনের ব্যাখ্যা ও গবেষণামূলক সমালোচনা, আইনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ছন্দ ও সাহিত্য পাঠ করতো। উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীগণ জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন করতো।

আব্বাসীয় যুগে গৃহেই শিশুদের শিক্ষা শুরু হতো। ছয় বছর বয়সে বালক-বালিকারা স্কুলে ভর্তি হতো। আব্বাসীয় আমলে গৃহ শিক্ষক প্রথাও চালু ছিল। সে যুগে শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। আব্বাসীয় আমলে শিক্ষকগণ যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তখন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণকে মুয়াল্লিম বা ফকীহ বলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষকগণ মুয়াদ্দিব নামে অভিহিত ছিলেন। উচ্চ শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকগণকে উস্তাদ বলা হতো। উস্তাদবৃন্দ নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা বেতনভোগী ছিলেন।

পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের পর পনর বছরের যুবকরা সাধারণত উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে আসতো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আব্বাসীয় খলিফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের অনেকে সুপন্ডিতও ছিলেন। ফলে উমাইয়া আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা আব্বাসীয় আমলে মহীরুহে পরিণত হয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ সুগম করেছে। তাই বর্তমান সভ্যতা মুসলমানদের নিকট ঋণী।

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাধারণত জাতীয় আদর্শ, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, সমকালীন চাহিদা ইত্যাদি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়ক। ইসলামী জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্য এক আল্লাহতে বিশ্বাস এবং কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি সাধন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আর এ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদীস। তাই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে। খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকাল থেকে শুরু করে আব্বাসীয় আমল পর্যন্ত

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ধারিত হয়েছিল। ইসলাম বাস্তবতা বিবর্জিত ধর্ম নয়। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। ইসলামের সাথে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ কোন বিরোধ নেই। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ।

১। এক আল্লাহ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি বিশ্বাস।
২। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন।
৩। ইসলামী আদর্শবাদে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী জীবন গঠনে সাহায্য করা।
৪। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করা, সার্থক উম্মত হিসেবে নিজকে গড়ে তোলা এবং অন্যকে উক্ত আদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।
৫। মানব কল্যাণে ব্রতী হওয়া।
৬। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ সৃষ্টি করা।
৭। ইসলামের আলোকে নবতর সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
৮। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার পরিহার করা।
সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ও রসূল (স.) প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইসলামী শিক্ষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শিক্ষা সৃষ্টিকুলের জন্যে সার্বিকভাবে কল্যাণকর। ইসলামী শিক্ষার রূপকার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। মানব রচিত অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নিম্নে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি তথা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল-

তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাই ইসলামী হতে পারে না।

ধর্ম ও বৈষয়িক শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়

ইসলামী শিক্ষা এককভাবে বৈষয়িক কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষা নয়। বরং মানব জাতির গোটা জীবনব্যবস্থা তথা পার্থিব ও বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য, সে শিক্ষাকে যদি ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পরিবেশন করা হয়, তা হলেই সেটা ইসলামী শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা একটি সমন্বিত শিক্ষা।

ওহী ভিত্তিক শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা পুরোপুরি ওহীভিত্তিক। ইসলামের বাণী ঃ اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

"পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক : ১)

সুতরাং ইসলামের সমস্ত শিক্ষাই ওহীর আলোকে রচিত।

কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা

ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে রচিত। তাই মানুষের পার্থিব জীবনে যে সব শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তৈরি করলে তাই ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়। আল্লাহ বলেন ঃ "রাসূল যা নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা বর্জন কর।"

রাসূল (স) বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দুটো বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা এদুটো বস্তু অবলম্বন করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"

আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের উপযোগী শিক্ষা

মানুষ পৃথিবতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً

''আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।'' (সূরা আল-বাকারা : ৩০)

খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য যোগ্যতা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই।

পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধকারী

ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সকল প্রকার অন্যায়-অসত্য ও কলুষ থেকে পূত:পবিত্র করে। মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস, চেতনা ও চরিত্রকে পরিশোধিত করে। আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

''তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের মাঝে নবী পাঠিয়েছেন, তাদেরকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানোর জন্য এবং তাদেরকে পুত:পবিত্রকরণের জন্য।'' (সূরা আল-জুমুআ : ২)

আদর্শিক ভাবধারা পুষ্ট

ইসলামী শিক্ষা একটি মহান আদর্শের ধারক-বাহক। এ শিক্ষাই মানুষকে আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য।

সর্বজনীন শিক্ষা

ইসলামে শিক্ষার দ্বার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। অর্থাৎ পৃথিবীর সব রকমের মানুষই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মানুষ এক জাতি-এ সত্যকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে একমাত্র শিক্ষা। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার এ সর্বজনীন রূপ বিপর্যস্ত মানব জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে সক্ষম।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা মানুষকে পবিত্রভাবে বাঁচতে ও চিন্তা করতে শেখায়। মহানবী (স.) বলেন, "আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দান করার জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।"

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রয়োজনে শিক্ষা দরকার। কুরআন ও হাদীসে মানুষের এই উভয়বিধ জীবনের কল্যাণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের চাহিদার সমন্বয় হওয়া দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

উত্তর সঠিক হলে ''স'' মির্থ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

১. বর্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি মুসলমানদের অবদানের ফসল।
২. মহানবী (স) এর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন।
৩. মহানবী (স) নিরক্ষরদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের জন্য আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালান।
৪. উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক, প্রথম ওয়ালিদ ও উমর ইবন আবদুল আযীয জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।
৫. আব্বাসীয় যুগে শিক্ষার দু'টি স্তর ছিল।
৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নৈর্বাচনিক উত্তর-প্রশ্নঃ

১. আসহাবে সুফফার জন্য প্রতিষ্ঠিত মহানবী (স)-এর আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি কোথায় অবস্থিত?
ক. মদীনায়; খ. মদীনার মসজিদে নববীতে;
গ. মসজিদে কুবায়; ঘ. মক্কা শরীফে।

২. দারুল আরকাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়-
ক. হযরত মুহাম্মদ (স) -এর যুগে; খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে;
গ. হযরত আলী (রা)-এর যুগে; ঘ. হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয-এর যুগে।

৩. হযরত আলী (রা) কর্তৃক রচিত হাদীস গ্রন্থের নাম ছিল-
ক. বুখারী শরীফ; খ সহিফা;
গ. মুআত্তা; ঘ. মিশকাত শরীফ।

৪. কোন আমলে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. উমাইয়া যুগে; খ. আব্বাসীয় যুগে;
গ. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে; ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

৫. কার যুগে সরকারীভাবে হাদীস সংকলন শুরু হয়?
ক. হযরত উমর (রা.) -এর যুগে; খ. হযরত আলী (রা.) -এর যুগে;
গ. হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (র). -এর যুগে; ঘ. হযরত উসমান (রা.) -এর যুগে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
২. ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করুন।
৩. ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. শিক্ষা বিস্তারে মহানবী (স) -এর কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে মহানবী (স) -এর অবদান আলোচনা করুন।
২. শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে খুলাফায়ে-রাশেদূনের অবদান বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের অবদান আলোচনা করুন।

ইসলামী রাষ্ট্রের জন ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা

পাঠ ঃ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলাম কি কি কল্যাণমূলক ও জনহিতকর কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে তা আলোচনা করতে পারবেন;
- জনহিতকর কাজ হিসেবে যাকাত, বায়তুলমাল ও ওয়াকফ-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রে সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থায় কর্জে হাসানা ও সাদকাহর গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ও সমাজব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক অর্থাৎ মানব জীবনের সর্বদিকের সুষ্ঠু ও সুন্দর সমন্বয় সাধন করে মানুষকে সুখ, শান্তি, প্রগতি ও পূর্ণতা অর্জনের দিকে এগিয়ে দেয়াই ইসলামের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের রূপকার ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)।

মহানবী (স) এর আগমন ছিল সমগ্র সৃষ্টির পরিপূর্ণ কল্যাণ ও আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি ছিলেন জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদে সবার পথপ্রদর্শক। তিনি সেবক হিসেবে বিশ্বমানবের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মানব কল্যাণই ছিল তাঁর প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর চোখে সব মানুষ সমান।

বস্তুত মহানবী (স) একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন নি অথবা শুধু আরব সমাজের জন্য তার আবির্ভাব হয়নি। তিনি ছিলেন শান্তির দূত। তিনি আজীবন মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম। ইসলামে মানব কল্যাণকে ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। মহানবী (স) -এর যুগ থেকেই মানব কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে।

ইসলামের সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদি

ইসলাম সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সামগ্রিক মানব কল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণ শুধু তাত্ত্বিক নয়; কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানও রয়েছে। সুশৃংখল ও সুখী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম প্রবর্তিত বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যুগ যুগ ধরে বহুমুখী সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করেই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিশ্বের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ইসলাম যেসব প্রতিষ্ঠান আর্তমানবতার কল্যাণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

যাকাত ব্যবস্থা

ইসলামের অন্যতম সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত। ইসলামী রাষ্ট্রের তথা বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা এবং সমাজ সেবা ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত। যাকাত প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমেই দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায়দের কল্যাণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়। ইসলাম মানব কল্যাণকে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়নি। যাকাত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা: যাকাত দেয়া প্রতিটি সামর্থ সম্পন্ন মুসলমানের জন্য যেমন একটি কর্তব্য ; তেমনি যাকাত প্রাপ্তদের পক্ষে এটি একটি অধিকার।

ইসলামী পরিভাষায় ঋণ ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহের পর শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা ধন-সম্পদ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করার প্রথাই যাকাত।

যাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। যাকাতদানের মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সম্পদের সুষম বন্টন প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে মানুষ সক্ষম হয়। যাকাতের মাধ্যমে যেমন সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়, তেমনি সামাজিক সংহতি, প্রগতি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ইসলামী বিধান মোতাবেক যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে দারিদ্র্য সমস্যার সমধান দেয়া আজও সম্ভব। মূলত শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ আনয়নের একমাত্র পথ হচ্ছে যাকাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

বায়তুলমাল ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজকোষকে বায়তুলমাল বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময় বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়তুলমালের কার্যক্রম শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জনগণের কল্যাণে বায়তুলমালই হচ্ছে বিশ্বের সর্বপ্রথম কার্যক্রম। বায়তুলমাল একদিকে যেমন দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্রদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত, অন্যদিকে বায়তুলমাল হতে বিনা সুদে সাধারণ ঋণ ও উৎপাদনী ঋণদানের ব্যবস্থা করা হতো।

বায়তুলমালের দর্শন ও কার্যক্রম সামাজিক নিরাপত্তা, দুঃস্থ অসহায়দের কল্যাণ এবং দরিদ্র আইন প্রণয়নের নীতি-নির্ধারণে আধুনিক সমাজ কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওয়াকফ ব্যবস্থা

ইসলামী আইনে স্বীকৃত অন্যতম সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ওয়াকফ ব্যবস্থা। ইসলামী বিধান অনুযায়ী কোন মুসলমান কর্তৃক ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে তার সমুদয় সম্পত্তি বা অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে স্বত্বত্যাগ করে দান করার প্রথাকেই ওয়াকফ বলা হয়।

সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাক-শিল্প যুগে ওয়াকফ প্রথার মাধ্যমেই সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ সেবার সূত্রপাত হয়। বর্তমানেও সারা মুসলিম বিশ্বে এতিমখানা, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ওয়াকফ প্রথায় যেমন ব্যক্তিগত কল্যাণ নিশ্চিত হয় তেমনি সমষ্টিগত কল্যাণও সাধিত হয়। বাংলাদেশে এতিম, দুঃস্থ ও অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ১,৫৫,৫৫৩টি ওয়াকফ স্টেট কর্মরত রয়েছে। (১৯৮৬ সালের ওয়াকফ প্রশাসকের জরিপ অনুযায়ী)

করযে হাসানা ব্যবস্থা

ইসলামের অন্যতম সমাজকল্যাণ প্রথা হচ্ছে করযে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণব্যবস্থা। ইসলাম অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, অপরদিকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনাসুদে ঋণদানের চূড়ান্ত ও স্থায়ী ব্যবস্থা করেছে। বিনা সুদে ঋণদান প্রথমদিকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হতো। হযরত উমর (রা.)-এর আমলে বিনা সুদে ঋণদান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হতো। সরকারী কর্মচারীগণ তাদের চাকুরীর আমানতে বায়তুলমাল হতে বিনাসুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারত। মূলত ঋণদান সমিতির ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালই বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান।

করযে হাসানার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা এবং অথনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন সরবরাহ করা। সুদমুক্ত ঋণের ধারণার উপর ভিত্তি করেই বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

সাদকাহ ব্যবস্থা

ইসলামের অন্যতম সমাজসেবা প্রথা হচ্ছে সাদকাহ্ বা দান। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদশালী মুসলমানদের আদায় করতে হয়। শুধু যাকাত প্রদান করেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে যাকাতদানের পরও সম্পদশালীদের অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। সাদকাহ বা দান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে স্বীকৃত। সাদকাতুল ফিতর, কোরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থদান ইত্যাদি প্রথা বর্তমানেও দরিদ্র অভাবিদের কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

এছাড়া ইসলাম সাধারণ দানের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। কুরআনের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, ''কেবল পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ করাই সত্যিকার নেক কাজ নয়। বরং আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহর ভালবাসার বশবর্তী হয়ে নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, অভাবগ্রস্ত ও কৃতদাসদের জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং নামায পড়া ও যাকাত দেয়া হলো যথার্থ নেক আমল। ''(সূরা আল-বাকারা : ১৭৭))

সূতরাং দেখা যায় যে, ইসলাম প্রত্যক্ষ নির্দেশের মাধ্যমে যেমন মানবতার সেবা করার জন্য তাগিদ দিয়েছে, তেমনি পরোক্ষভাবে সমাজ ও জাতির কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

এছাড়া মসজিদ বিনির্মাণ, মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে শিক্ষার সম্প্রসারণ, রাস্তা ঘাট, পুল এবং উত্তম সামাজিক কাজ করার জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেছে। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি ঘর বানালো আল্লাহও তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করলে। ইয়াতিমকে লালন-পালন, আশ্রয় প্রদান গৃহপরিচারিকাকে শিক্ষাপ্রদান ও বড় হলে তার বিবাহ ব্যবস্থার প্রতি ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। এসব হচেছ ইসলামী রাষ্ট্রে জনহিতকর কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলাম কেমন ধর্ম?

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধর্ম; খ. মানব কল্যাণের ধর্ম;
গ. ব্যক্তিগত কল্যাণের ধর্ম; ঘ. শুধু আরবদের কল্যাণের ধর্ম;

২. ইসলামী রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা কোনটি-

ক. ওয়াকফ ব্যবস্থা; খ. যাকাত ব্যবস্থা;
গ. রাস্তা-ঘাট নির্মাণ; ঘ.সবক'টি উত্তরই ঠিক।

৩. রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জনগণের কল্যাণে বায়তুলমালই হচেছ বিশ্বের-

ক. একমাত্র কার্যক্রম; খ. সর্বপ্রথম কার্যক্রম;
গ. দ্বিতীয় কার্যক্রম; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৪. করযে হাসানা হল-

ক. সুদ মুক্ত ঋণ; খ. লাভজনক ঋণ;
গ. সুদসহ ঋণ; ঘ. একটি দান।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে যাকাত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে বায়তুলমাল সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে ওয়াকফ সম্পর্কে লিখুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে কর্জে হাসানা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের জন ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন